সন্ত্রাস ও সংলাপ ॥অপশাসনের দু'টি বাহু

আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী

জোট সরকার ক্ষমতায় বসার পর থেকেই দেশে গত চার বছর ধরে যারা সন্ত্রাস সৃষ্টি করছে, হত্যার রাজনীতি চালাচ্ছে, একাত্তরের মতো যে হত্যার রাজনীতির একমাত্র বেনিফিসিয়ারি বিএনপি, তাদের কাছে কি সেই সন্ত্রাসীদের পরিচয় অজানা? বর্তমান জোট সরকারের ভেতরেই তো '৭১ ও '৭৫-এর অনেক ঘাতককে খুঁজে পাওয়া যাবে। প্রধানমন্ত্রী তাদের বর্জন করে গণতন্ত্রমনা, শান্তিকামী জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে তাঁর মন্ত্রিসভা পুনর্গঠনে রাজি আছেন কি? হাওয়া ভবনের উৎপাত বন্ধ করতে সম্মত আছেন কি? সামরিক ও অসামরিক প্রশাসনকে অবিলম্বে দলীয়করণের নীতি থেকে মুক্ত করা এবং বিচার বিভাগকে অবিলম্বে স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা প্রদানে প্রস্তুত আছেন কি? র‍্যাব ভেঙ্গে দিতে, দ্রুত বিচার আইনসহ কালাকানুনগুলো প্রত্যাহারে এগিয়ে আসবেন কি? প্রধানমন্ত্রী যদি এসব ব্যাপারে রাজি না হন, তাহলে শেখ হাসিনার সঙ্গে তিনি সংলাপে বসবেন কিসের ভিত্তিতে, কী এজেন্ডা নিয়ে? আগেই বলেছি, পারস্পরিক কুশল বিনিময়ের সময়তো এটা নয়। যে বাঘের দাঁতে নিহত মুরগির রক্ত, তার সঙ্গে সংলাপে বসতে কোন মুরগিই রাজি হতে পারে না। মুরগি-চোর খেঁকশিয়ালেরা নিজেদের স্বার্থে বাঘের নিরামিষাশী হওয়ার গল্প প্রচার করতে পারে; কিন্তু প্রতিটি মুরগি জানে খেঁকশিয়ালের আসল উদ্দেশ্য কী? বাংলাদেশের একশ্রেণীর সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবীর মধ্যেও মুরগি-চোর খেঁকশিয়ালের চরিত্রের কিছু লোক আছেন। বর্তমানের সংলাপ বাহিনীতেও তাঁদের খুঁজে পাওয়া যাবে

গত রবিবার ২৯ আগস্ট পূর্ব লন্ডনের আলতাব আলি পার্কে গায়েবানা জানাজা ও শোকসভায় যোগ দিতে গিয়েছিলাম। ২১ আগস্ট ঢাকায় শেখ হাসিনার জনসভায় যে মিনি কারবালা সৃষ্টি করা হয়েছিল, তাতে যাঁরা নির্মম মৃত্যুবরণ করেন, তাঁদের আত্মার শান্তি কামনা এবং তাঁদের বর্বর হত্যাকাণ্ডে ক্ষোভ ও শোক প্রকাশের জন্য পূর্ব লন্ডনের উন্মুক্ত পার্কে, খোলা আকাশের নিচে সর্বদলীয় ভিত্তিতে এই জানাজা ও শোকসভার আয়োজন করা হয়েছিল। যুক্তরাজ্যের আওয়ামী লীগ, সিপিবি, জাসদ, ওয়ার্কার্স পার্টি ইত্যাদি সকল দলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরাই এই সমাবেশে যোগ দিয়েছিলেন। আকাশটি ছিল মেঘাবৃত এবং যে কোন সময় মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হতে পারে–এই আশঙ্কা থাকা সত্ত্বেও বিলেতের বাঙালি কম্যুনিটির অসংখ্য লোক এই গায়েবানা জানাজা ও শোকসভায় শরিক হয়েছিলেন।

এই শোকসভাতেই বাংলাদেশের এক সাবেক বিচারপতি শামসুদ্দীন চৌধুরী মানিক আমার হাতে তুলে দিলেন আগের দিন ২৮ আগস্ট শনিবারের দৈনিক 'ইনকিলাব' পত্রিকাটি। বললেন, তাঁর এক বন্ধু ওই দিনই ঢাকা থেকে লন্ডনে এসে পৌঁছেছেন। তিনি শনিবারের কিছু দৈনিক পত্রিকা ঢাকা থেকে নিয়ে এসেছেন। তার মধ্যে ইনকিলাব কাগজটি আছে। বিচারপতি শামসুদ্দীন চৌধুরীর অনুরোধ, আমি যেন ওই দিনের ইনকিলাবে প্রকাশিত অন্তত তিনটি লেখা পড়ে দেখি। এই তিনটি লেখা হলো, সাতের পৃষ্ঠায় প্রকাশিত মূল সম্পাদকীয় নিবন্ধ 'দুই নেত্রীর সংলাপ' এবং সতেরোর পৃষ্ঠায় প্রকাশিত দুই মরহুম কমরেড এবং বর্তমানের 'ইনকিলাবি কলামিস্ট' সাদেক খান ও ড. মাহবুবউল্লাহ্‌র লেখা দু'টি প্রবন্ধ। দু'টি নিবন্ধেই ইনকিলাবের সম্পাদকীয় মন্তব্যের প্রতিধ্বনি করে শেখ হাসিনার সঙ্গে বেগম খালেদা জিয়ার বৈঠকে বসার উদ্যোগের প্রশংসা করা হয়েছে এবং দুই নেত্রীর সংলাপের মধ্যেই দেশের সমস্যার সমাধান বলে জোর ওকালতি করা হয়েছে।

সাবেক বিচারপতিকে বলেছিলাম, ইনকিলাব আমি সব সময় দেখি না এবং পড়িও না। কারণ পত্রিকাটির প্রতি পৃষ্ঠায় ময়লানা মান্নানের গায়ের দুর্গন্ধ পাওয়া যায়। তবে মাঝে মাঝে প্রয়োজন হলে ইন্টারনেট থেকে কোনো কোনো লেখা বের করে পড়ি। সাংবাদিকতার নামে ইনকিলাবের দুর্বৃত্তপনা সামলানোর দায়িত্ব নিয়েছেন আমার আরেক কলামিস্ট বন্ধু মহিউদ্দীন আহমদ (বাংলাদেশের ফরেইন অফিসের সাবেক ভারপ্রাপ্ত সচিব)। ইনকিলাব প্রসঙ্গ না থাকলে তাঁর লেখা জমে না, ক্ষুরধার হয়ে ওঠে না।

শামসুদ্দীন চৌধুরী আমার কথা শুনে বলে উঠেছেন, মহিউদ্দীন আহমদ তো ইনকিলাবের খচ্চরামি নিয়ে লিখবেনই। কিন্তু আপনিও এই তিনটি লেখা পড়ে কিছু লিখুন। আমার মনে হয় জোট সরকার তাদের সন্ত্রাস ঢাকা দেওয়া এবং গণরোষ থেকে বাঁচার জন্য সংলাপী বাহিনী মাঠে নামিয়েছে। আপনি শনিবারের ইনকিলাবের সম্পাদকীয়, সাদেক খান ও মাহবুবউল্লাহ্‌র লেখা দু'টি পড়লেই বুঝতে পারবেন একুশে আগস্টের রক্তঝরা সন্ত্রাসের পর এই মধুক্ষরা শান্তির বাণী ও সংলাপের কথা উচ্চারিত হচ্ছে কেন?

রবিবারে বাসায় ফিরতে বহু রাত হয়ে গিয়েছিল। চোখ ঘুমে ঢুলু ঢুলু। তবু সোফায় শুয়ে 'ইনকিলাবের' লেখা তিনটি পড়ে ফেললাম। বুঝতে বাকি রইলো না, এই লেখার সঙ্গে ইতিপূর্বে নিউএজ, হলিডে, যায়যায়দিন ও যুগান্তরে প্রকাশিত এনায়েতউল্লাহ খান, শফিক রেহমান, আতাউস সামাদ, ফরহাদ মজহার প্রমুখ সম্পাদক ও সাহিত্যিকদের লেখার বক্তব্য ও উদ্দেশ্যের কোনো পার্থক্য নেই। সকলের মুখেই শান্তি ও সংলাপের বাণী। সকলেই শান্তির কমণ্ডলু নিয়ে মাঠে নেমেছেন। মনে পড়ল, পঞ্চাশের দশকের কবি নরেশ গুহের একটি বিখ্যাত কবিতার লাইন–'শান্তিও যদি সিংহের মতো গর্জায়, তাকে ডরাই।'

আপাতত এই সংলাপী বাহিনী সিংহের মতো গর্জাচ্ছে না। এখন তারা নিরীহ, নিরপেক্ষ মেষশাবক। কিন্তু ২০০১ সালের অক্টোবর-নির্বাচনের পর থেকেই এদের কণ্ঠে শোনা গেছে সিংহের নর্তন-কুর্দন। হাসিনার চরিত্র-নিধন, দেশে মৌলবাদীরা ঘাঁটি গাড়ছে–এ কথা বলা হলেই দেশের ভাবমূর্তি নষ্ট করা হচ্ছে বলে জোট সরকারের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে কোরাস শুরু করা, দেশে একটার পর একটা নৃশংস রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড চলা সত্ত্বেও সে সম্পর্কে চাতুরিপূর্ণ কথাবার্তা বলে এবং আওয়ামী লীগের অতীত কর্মকাণ্ড অতিরঞ্জিতভাবে তুলে ধরে বিএনপি-জামায়াত সরকারকে রক্ষার চেষ্টা করা, এমনকি হুমায়ুন আজাদের নৃশংস হত্যাচেষ্টা এবং আহমদিয়া সম্প্রদায়ের উপর জামায়াতী ও উগ্র মৌলবাদীদের চরম নির্যাতন সত্ত্বেও জামায়াতীদের বর্তমানে নমনীয় নীতির অনুসারী ইসলামী দল বলে

সার্টিফিকেট দেওয়া, অক্টোবর নির্বাচনের আগে থেকেই প্রচণ্ড হিন্দু-নির্যাতন চলা সত্ত্বেও দেশে সাম্প্রদায়িক শান্তি বিরাজ করছে এবং সবই আওয়ামী লীগের অপপ্রচার বলে সরকারী প্রোপাগাণ্ডায় গলা মেশানো–এই ছিল বর্তমানের সংলাপী বাহিনীর বুদ্ধিজীবী, সম্পাদক ও কলামিস্টদের একমাত্র ভূমিকা।

গত ২১ আগস্ট হাসিনার জনসভায় প্রচণ্ড গ্রেনেড হামলার ভয়াবহ বর্বরতার মধ্য দিয়ে এতোদিনের ঘাতকচক্রের মুখোশ ছিন্ন হয়ে যেতেই তারা এই ঘাতকচক্রকে রক্ষার জন্য সন্ত্রাসী সন্ত্রাসী বলে চিৎকার শুরু করেছেন এবং হাসিনা ও খালেদাকে এক বৈঠকে বসিয়ে সংলাপ শুরু হলেই সন্ত্রাসী সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে বলে প্রচার শুরু করেছেন। আমার প্রশ্ন, যদি তাই হবে তাহলে এতোদিন তারা এই সংলাপ শুরু করার জন্য দাবি জানাননি কেন? এবং এখনই বা দেশে অব্যাহত সন্ত্রাসের যারা আসল নায়ক, তাদের চিহ্নিত করছেন না কেন? এই সন্ত্রাসীদের চিহ্নিত না করে হাসিনা ও খালেদা কেবল এক টেবিলে বসে কি অদৃশ্য শত্রুর বিরুদ্ধে হাওয়ায় গদা ঘোরাবেন? হাওয়ায় গদা ঘুরিয়ে খালেদা জিয়া গণরোষ থেকে আপাতত বাঁচতে পারবেন। কিন্তু হাসিনা বাঁচতে পারবেন কি? সন্ত্রাসীদের আড়াল করে হাসিনার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে যে খালেদা-নিজামী জোট, যারা একাত্তর ও পঁচাত্তরের খুনীদের নিয়ে মন্ত্রিসভা গঠন করেছে, বঙ্গবন্ধুর আত্মস্বীকৃত খুনীদের বিচার থেকে রক্ষা করার জন্য নানারকম টালবাহানা করে চলেছে, খুনীদের জেলের ভিতরে ফাইভ স্টার হোটেলের আরাম আয়েশে রেখেছে এবং এই খুনীদের প্রতি যাদের সহানুভূতি ও দরদ সর্বজনবিদিত এবং যে খুনীরা বর্তমান সরকারেরই প্রশ্রয় ও পৃষ্ঠপোষকতায় শেখ হাসিনাসহ আওয়ামী লীগের অবশিষ্ট নেতাদেরও হত্যা করার একটার পর একটা চক্রান্ত করে চলেছে, যার চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে গত একুশে আগস্ট তারিখে, তাদের প্রধান নেত্রীর সঙ্গে লোক দেখানো সাক্ষাত বা বৈঠক করে শেখ হাসিনা দেশের গণতান্ত্রিক জীবনের নিরাপত্তা দূরে থাক, নিজের জীবনের নিরাপত্তাও নিশ্চিত করতে পারবেন কি?

আসলে একুশে আগস্টের ভয়াবহ ঘটনায় নিশ্চিত মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসে শেখ হাসিনা যখন মানসিক ও শারীরিকভাবে সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত, তখন তাঁর সঙ্গে বেগম জিয়ার দেখা করা বা সংলাপ শুরু করার প্রস্তাব একটি গিমিক ছাড়া আর কিছু নয়। গণরোষ থেকে কৌশলে আত্মরক্ষা, ক্ষমতার টলটলায়মান অবস্থা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সময় নেওয়া এবং সময় নিয়ে ক্ষমতায় শক্ত হয়ে আবার নির্যাতনের লাঠি ঘোরানোর সুযোগ গ্রহণই ছিল এই প্রস্তাব দেওয়ার মূল উদ্দেশ্য। আরও একটি উদ্দেশ্য ছিল বেগম খালেদা জিয়ার এই নমনীয় চেহারা ধারণের। একুশে আগস্টের ঘটনা দেশে-বিদেশে তার সরকারের আসল চেহারা খুলে দিয়েছে। অধিকাংশ রাষ্ট্রপ্রধান এবং বিদেশী কূটনীতিকরা শেখ হাসিনার কাছে সহানুভূতি ও সমবেদনার বাণী পাঠিয়েছেন এবং কেউ কেউ দেখা করেছেন। জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল পর্যন্ত এই ভয়াবহ সন্ত্রাসে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন এবং কেউ কেউ এই সন্ত্রাস দমনে জোট সরকারের অক্ষমতা অথবা অনাগ্রহের দিকেও ইঙ্গিত করেছেন।

শেখ হাসিনার সঙ্গে তড়িঘড়ি প্রধানমন্ত্রীর সাক্ষাতকারের এই প্রস্তাবটি বিদেশীদের চোখে ধুলো দেয়া এবং তাদের কাছে জোট সরকারের সন্ত্রাস দমনের আগ্রহ ও আপোসবাদী চেহারা তুলে ধরারও একটা কৌশল। এই কৌশলটি আবার দু'দিকেই শান দেয়া ছুরির মতো। যদি শেখ হাসিনা জোট সরকারের এই পরিকল্পিত ট্র্যাপে পা দেন, তাহলে তো জোট সরকারকে বাঁচিয়ে দিলেন। আর যদি না দেন, তাহলে দেশে-বিদেশে এই সংলাপী বাহিনীর দ্বারাই তুমুল প্রচার শুরু করা হবে যে, বেগম জিয়া শুভেচ্ছা ও সদিচ্ছার মনোভাব নিয়ে এবং দেশ থেকে সন্ত্রাস দূর করার প্রকৃত আগ্রহ নিয়ে হাসিনার দিকে হাত বাড়িয়েছিলেন। হাসিনা সেই হাত ফিরিয়ে দিয়েছেন। দেশকে শান্তিপূর্ণ আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সন্ত্রাস ও সমস্যামুক্ত করার কোন ইচ্ছা ও আগ্রহ তাঁর নেই।

আমার এই সন্দেহটি যথার্থ কিনা, পাঠকেরা তাঁর প্রমাণ পাবেন, ২৭ আগস্ট শুক্রবারের দৈনিক ইনকিলাব ও দৈনিক প্রথম আলোর প্রথম পৃষ্ঠার প্রথম খবরটি লক্ষ্য করলে। আমি প্রথমে ইনকিলাবের খবরটি লক্ষ্য করিনি। আমার এক বন্ধু খবরটির দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। বিস্মিত হয়ে দেখেছি, দুই পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠার প্রথম লীড নিউজ সম্পূর্ণ এক। সেটি শেখ হাসিনা কর্তৃক প্রধানমন্ত্রীর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার খবর। দু'টি পত্রিকাই এমনভাবে খবরটি প্রচার করেছে, যাতে মনে হতে পারে প্রধানমন্ত্রী যে সদিচ্ছা ও আন্তরিকতা নিয়ে বিরোধী দলের নেত্রীর দিকে এগিয়ে গিয়েছিলেন, বিরোধী দলের নেত্রী তাতে না বলে দিয়েছেন। একটি পত্রিকা লিখেছে, খালেদার প্রস্তাবে হাসিনার না। আরেকটি লিখেছে খালেদার প্রস্তাব হাসিনা নাকচ করেছেন। না এবং নাকচের শব্দগত পার্থক্য ছাড়া দু'টি পত্রিকার খবরের ভাষা ও সারমর্ম প্রায় একই। এই খবরটি এভাবে প্রচারের উদ্দেশ্য দুই পত্রিকার একই ছিল কিনা কে বলবে? শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে ইনকিলাব ও প্রথম আলোর গলাগলি ভাবতো আজকের নয়। যদিও একজন হাসিনার বিরুদ্ধে ডানদিক থেকে তলোয়ার উঁচিয়ে আছেন, অন্যজন বাম দিক থেকে।

বিবদমান দুই পক্ষের মধ্যে বৈঠক, আলাপ-আলোচনা অবশ্যই সকলের কাম্য হওয়া উচিত, যদি সেই আলাপ-আলোচনার প্রস্তাবের মধ্যে কোন পক্ষের চালাকি লুকিয়ে না থাকে। অবিভক্ত ভারতে রাজনৈতিক বিরোধ মীমাংসার জন্য কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ–তথা গান্ধী ও জিন্নার মধ্যে বহু বৈঠক হয়েছে। কখনও কংগ্রেসের এবং কখনও মুসলিম লীগের চালাকির জন্য তা সফল হয়নি। শেষ পর্যন্ত বানরে পিঠা ভাগ করেছে। ইংরেজরা অস্বাভাবিকভাবে দেশটাকে ভাগ করে দিয়ে বিদায় নিয়েছে, তাতে সমস্যার সমাধান হয়নি; বরং একটার পর একটা সমস্যার জটিলতা বেড়েই চলেছে।

ইসরাইল ও ফিলিস্তিনের মধ্যে বারবার শান্তি আলোচনা, যুদ্ধবিরতি চুক্তি আমেরিকার চাপিয়ে দেওয়া চালবাজি মাত্র। ইয়াসির আরাফাত দুর্নাম এড়ানোর জন্য বারবার আপোস প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন। মিসরসহ কয়েকটি আরব দেশ ইসরাইলকে স্বীকৃতি দিয়েছে। আরাফাত শান্তি চুক্তির সব শর্ত মেনে তেল আভিভ পর্যন্ত সফর করেছেন, আততায়ীর হাতে নিহত এক ইসরাইলী প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রীর হাতে পর্যন্ত চুমু খেয়েছেন, তাতেও ইসরাইল শান্তি চুক্তিগুলোকে কোনভাবে সম্মান দেখায়নি। অবৈধভাবে ফিলিস্তিনীদের ভূমি দখল এবং ফিলিস্তিনী নারী-শিশুদের হত্যা এখনও অব্যাহত রয়েছে। আর এর বিরুদ্ধে যখনই ফিলিস্তিনীরা মরিয়া হয়ে রুখে দাঁড়ায়, তখনই বলা হয় ওরা টেরোরিস্ট। তারা ইসরাইলের সঙ্গে শান্তি প্রতিষ্ঠা চায় না। পশ্চিমা জগতেও ইসরাইলের অর্থপুষ্ট ও অনুগ্রহভোগী একটি সংলাপী

সাংবাদিক ও কলামিস্ট বাহিনী আছে, যাদের একমাত্র চিৎকার হচ্ছে সংলাপ, সংলাপ। ফিলিস্তিনীদের অস্ত্রত্যাগ করে ইসরাইলীদের শর্তে, ইসরাইলের দাস হয়ে ফিলিস্তিনে বাস করতে হবে।

বাংলাদেশেও বিএনপি-জামায়াত সরকারের দেশ শাসনের বা অপশাসনের দু'টি বাহু। একটি সন্ত্রাসী বাহু, যা দেশে রেইন অব টেরর প্রতিষ্ঠা করে গণতান্ত্রিক পন্থায় নয়, ফ্যাসিবাদী কায়দায় এই রাজত্ব চিরস্থায়ী করতে চায়। অন্য বাহুটি সংলাপী বাহিনীর এবং তারা চায় একই উদ্দেশ্যে দেশে প্রচার ও প্রোপাগাণ্ডা মারফত বিভ্রান্তির ধূম্রজাল সৃষ্টি করে রাখতে। নইলে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে শেখ হাসিনার বৈঠকের ব্যাপারে গোড়া থেকেই একতরফা প্রচার না চালিয়ে তাঁরা এই বৈঠক অনুষ্ঠানের পরিবেশ ও পরিস্থিতি সৃষ্টি করার জন্য সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করতেন। এই পরিবেশ সৃষ্টির প্রথম পদক্ষেপই ছিল, একুশের সন্ত্রাসের মূল লক্ষ্য যে ছিল শেখ হাসিনাসহ আওয়ামী লীগের গোটা নেতৃত্বকে উচ্ছেদ করা, প্রধানমন্ত্রীর এই সত্যটি স্বীকার করে নেওয়া এবং দ্ব্যর্থহীন ভাষায় শেখ হাসিনার প্রাণনাশের চেষ্টার নিন্দা করা।

প্রধানমন্ত্রী সে কাজটি করেননি। শেখ হাসিনার কাছে ফ্যাক্সযোগে প্রেরিত তাঁর পত্র এবং তাঁর সরকারের প্রেস নোটে পর্যন্ত শেখ হাসিনার প্রাণনাশের চেষ্টার কথা এবং তাতে উদ্বেগ প্রকাশ ও নিন্দাজ্ঞাপন নেই। আর দশটা সাধারণ সন্ত্রাসী ঘটনায় প্রধানমন্ত্রীর মামুলি উদ্বেগ প্রকাশের মতো একুশে আগস্টের এতো বড় ঘটনাতেও তাঁর প্রতিক্রিয়া একই। সরকারী প্রেসনোটকেও ঘটনার গুরুত্ব চাপা দেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রীর চিঠিতে ব্যক্ত মনোভাবেরই প্রতিলিপি বলা চলে। এই মনোভাব নিয়ে একটি বিপর্যস্ত দল ও তার নেত্রীকে সান্ত্বনা দেওয়া যায় না এবং তার সঙ্গে সাক্ষাতের অনুকূল পরিবেশও সৃষ্টি করা যায় না। এই সাক্ষাতকারের ইচ্ছা প্রকাশে প্রধানমন্ত্রীর কতোটা আন্তরিকতা ছিল এবং কতোটা ছিল রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেপ্রণোদিত পাবলিসিটি-স্ট্যান্ট সে সম্পর্কে আমার মনে সন্দেহ আছে।

দ্বিতীয়ত, একুশের ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ কেন সন্ত্রাসীদের পেছনে ধাওয়া না করে আহত ও নিহতদের উদ্ধারের জন্য এগিয়ে আসা সাধারণ মানুষ এবং আওয়ামী লীগের কর্মীদের উপর নির্মম লাঠি চালালো ও কাঁদানে গ্যাস ছুড়লো তার তাৎক্ষণিক কৈফিয়ত স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্র সচিবের কাছে চাওয়া উচিত ছিল। তাদের কাছে আরও জানতে চাওয়া উচিত ছিল যে, দেশে এতো ঘন ঘন সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটা এবং রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড চলা সত্ত্বেও প্রধান বিরোধী দলের নেত্রী এবং সাবেক প্রধানমন্ত্রীর জনসভায় এতো বড় সন্ত্রাসী হামলা সম্পর্কে গোয়েন্দা সংস্থা ও পুলিশ বিভাগ আগে কিছুই আঁচ করতে এবং জনসভার নিরাপত্তা বিধানে ব্যর্থ হলো কেন? এই বিরাট ব্যর্থতার জন্য হাসিনার সঙ্গে বৈঠকের প্রস্তাব দেওয়ার আগে প্রধানমন্ত্রীর কি উচিত ছিল না স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র সচিব, আইজি, ডিআইজি ও গোয়েন্দা সংস্থার প্রধানদের স্ব স্ব পদ থেকে অপসারণ করা? কোন গণতান্ত্রিক দেশে এ জাতীয় বড় সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটলে সরকার প্রথমেই যে ব্যবস্থাগুলো গ্রহণ করে, তার একটিও গ্রহণ না করে শেখ হাসিনার কাছে একটি মামুলি বৈঠকে বসার প্রস্তাব দেয়া কি তামাশা নয়?

সন্ত্রাস দমনে বিরোধী দলগুলোর সঙ্গে একযোগে কাজ করার সদিচ্ছা প্রধানমন্ত্রীর আছে– এ কথা প্রমাণ করার জন্য প্রথমেই উচিত ছিল একুশের ঘটনায় প্রকৃত সন্ত্রাসীদের না ধরে আওয়ামী লীগের কর্মী ও সমর্থকদের গ্রেফতার করার নীতি পরিত্যাগ করা এবং পুলিশ যাদের অন্যায়ভাবে গ্রেফতার করেছে তাদের অবিলম্বে মুক্তিদানের নির্দেশ দেওয়া। একুশের ঘটনার পর দেশের শোকসন্তপ্ত এবং বিক্ষুব্ধ মানুষ শান্তিপূর্ণভাবে গণতান্ত্রিক পন্থায় যে প্রতিবাদ সভা ও মিছিল করছে তার ওপর অগণতান্ত্রিক পন্থায় পুলিশী নির্যাতন না চালানো। মফস্বল এলাকায় এখনও চলছে গণগ্রেফতার ও পুলিশী নির্যাতন। পুলিশের লাঠিতে আহত হয়ে সিপিবির সাধারণ সম্পাদক মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম প্রশ্ন তুলেছেন, 'সরকার তো দেশে সভা-মিছিল করা নিষিদ্ধ করেনি। ১৪৪ ধারা জারি করেনি। তাহলে কোন্ আইন বলে পুলিশ আমাদের শান্তিপূর্ণ মিছিলে লাঠিচার্জ করল, আমাকে আহত করল?' আমার মতে, স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্র সচিবের কাছে এই প্রশ্নের আশু জবাব ও কৈফিয়ত তলব করা দরকার। কোন সন্তোষজনক কৈফিয়ত দিতে না পারলে তাদের বরখাস্ত করা উচিত। একদিকে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মী ও সাধারণ মানুষের ওপর প্রধানমন্ত্রীর পুলিশ লাঠি, বেয়নেট ও কাঁদানে গ্যাস চালাতে থাকবে, আর আওয়ামী লীগের নেত্রী সেই প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে 'মুক্তাগাছার মণ্ডা' সামনে নিয়ে পারস্পরিক কুশল বিনিময়ের বৈঠকে বসবেন, এমন কথা ভাবাও কি হাস্যকর নয়?

জোট সরকারের সংলাপ বাহিনীর প্রতিটি ভাড়াটিয়া বুদ্ধিজীবী ও কলামিস্টের– মায় ইনকিলাবে প্রকাশিত সাদেক খান ও ড. মাহবুব উল্লাহ্‌র লেখা দু'টিও আমি মনোযোগের সঙ্গে পড়েছি। তাদের লেখায় প্রধানমন্ত্রী ও সরকারের কাজের অনেক সাফাই গাওয়া হয়েছে। কিন্তু গত কয়েক বছর যাবত দেশে যে অব্যাহত সন্ত্রাস চলছে, সেই সন্ত্রাস দমনে সরকারের অনিচ্ছা, অনাগ্রহ এবং সার্বিক ব্যর্থতা সম্পর্কে টু শব্দটি নেই। সাদেক খান ও মাহবুব উল্লাহ্ দু'জনের লেখাতেই দেশে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের অনাবশ্যক দীর্ঘ তালিকা আছে। সেই কর্মকাণ্ডের মধ্যেই সন্ত্রাসীদের পরিচয়ও নিহিত। কিন্তু সংলাপ বাহিনীর বুদ্ধিজীবীদের অবস্থা ভাসুরের নাম নিতে ভাদ্র বৌয়ের মতো লজ্জানত। হাসিনার সঙ্গে বৈঠকের উপযোগী পরিবেশ তৈরি করার জন্য প্রধানমন্ত্রীর কী ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া উচিত ছিল তার কোন সুপারিশ বা প্রস্তাব নেই এই সংলাপ বাহিনীর কারো লেখাতেই, কেবল ঐক্য ঐক্য আর শান্তির কথা উচ্চারিত হয়েছে তাদের লেখায়। যেন ডাকাতের সঙ্গে গৃহস্থ গিয়ে একাসনে বসলেই ডাকাতি বন্ধ হয়ে যাবে। আসলে দেশে সন্ত্রাস, দুর্নীতি, সাম্প্রদায়িকতা ও হিংস্র মৌলবাদের পৃষ্ঠপোষক একটি সরকারের বিরুদ্ধে যখন ডান ও বামের গণতান্ত্রিক দলগুলো আজ দীর্ঘকাল পর একাত্তরের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে এতো মার খাওয়ার পরে সেই মার দেওয়া অপশক্তির বিরুদ্ধে ঐক্য গড়ে তুলতে চলেছে, তখন স্বাভাবিক ভাবেই অপশক্তির শিবিরে ভীতি দেখা দিয়েছে এবং তাদের তল্পিবাহকেরা ঐক্য, সংলাপ ইত্যাদি রব তুলে আসল গণঐক্যে বাধা সৃষ্টি করতে চাইছে।

জোট সরকার ক্ষমতায় বসার পর থেকেই দেশে গত চার বছর ধরে যারা সন্ত্রাস সৃষ্টি করছে, হত্যার রাজনীতি চালাচ্ছে, একাত্তরের মতো যে হত্যার রাজনীতির একমাত্র বেনিফিসিয়ারি বিএনপি, তাদের কাছে কি সেই সন্ত্রাসীদের পরিচয় অজানা? বর্তমান জোট

সরকারের ভেতরেই তো '৭১ ও '৭৫-এর অনেক ঘাতককে খুঁজে পাওয়া যাবে। প্রধানমন্ত্রী তাদের বর্জন করে গণতন্ত্রমনা, শান্তিকামী জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে তাঁর মন্ত্রিসভা পুনর্গঠনে রাজি আছেন কি? হাওয়া ভবনের উৎপাত বন্ধ করতে সম্মত আছেন কি? সামরিক ও অসামরিক প্রশাসনকে অবিলম্বে দলীয়করণের নীতি থেকে মুক্ত করা এবং বিচার বিভাগকে অবিলম্বে স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা প্রদানে প্রস্তুত আছেন কি? র‍্যাব ভেঙ্গে দিতে, দ্রুত বিচার আইনসহ কালাকানুনগুলো প্রত্যাহারে এগিয়ে আসবেন কি? প্রধানমন্ত্রী যদি এসব ব্যাপারে রাজি না হন, তাহলে শেখ হাসিনার সঙ্গে তিনি সংলাপে বসবেন কিসের ভিত্তিতে, কী এজেন্ডা নিয়ে? আগেই বলেছি, পারস্পরিক কুশল বিনিময়ের সময়তো এটা নয়।

যে বাঘের দাঁতে নিহত মুরগির রক্ত, তার সঙ্গে সংলাপে বসতে কোন মুরগিই রাজি হতে পারে না। মুরগি-চোর খেঁকশিয়ালেরা নিজেদের স্বার্থে বাঘের নিরামিষাশী হওয়ার গল্প প্রচার করতে পারে; কিন্তু প্রতিটি মুরগি জানে খেঁকশিয়ালের আসল উদ্দেশ্য কী? বাংলাদেশের একশ্রেণীর সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবীর মধ্যেও মুরগি-চোর খেঁকশিয়ালের চরিত্রের কিছু লোক আছেন। বর্তমানের সংলাপ বাহিনীতেও তাঁদের খুঁজে পাওয়া যাবে।

লন্ডন ॥৩০ আগস্ট সোমবার ॥২০০৪

আরেক আগস্ট ম্যাসাকার

এক অনন্য নারী নেত্রীর আত্মদান

সরদার আমজাদ হোসেন

দুজনেই সে দিনের প্রতিবাদ সমাবেশে গিয়েছিলেন। ৪৬ বছর ধরে দু'জনে দু'জনার। রাজনীতি, সমাজ প্রগতি নারী অধিকার, '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে সর্বত্র ওঁরা এক, অভিন্ন। একজনকে ছেড়ে আরেকজন ভাবা যায় না। ২১ আগস্টের নৃশংস বোমা হামলা ওঁদের দু'জনকে বিচ্ছিন্ন করেছে। হয়ত শোকে কাতর জিল্লুর রহমানকে আইভি রহমানের আত্মদানের ভয়াবহ অকল্পনীয় দৃশ্য তাঁর হৃদয় ভেঙ্গে দিয়েছে। তাই তিনি তাঁর মর্মবেদনার সহমর্মীদের বলেছেন 'আমাকে ছেড়ে ও চলে যাবে ভাবতেই পারিনি।' ধীর স্থির শান্ত জিল্লুর রহমান একজন প্রাজ্ঞ রাজনীতিক। ভাষা আন্দোলনের এক ক্রান্তিকালে ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারির পূর্ব রাতে (রাত ১২টা) যে ১১ নেতা-ছাত্রনেতা ঢাকা হল ও ফজলুল হক হলের মাঝখানে যে পুকুর আছে তার পূর্বধারের সিঁড়িতে যে সভা হয় সেখানের একজন ছিলেন জিল্লুর রহমান। সে সভাতেই সিদ্ধান্ত হয় যে কোন ত্যাগের বিনিময়ে ২১ ফেব্রুয়ারির ১৪৪ ধারা ভাঙতেই হবে। সেই ভাষা আন্দোলন থেকে স্বাধীনতা সংগ্রাম, মুক্তিযুদ্ধকালের প্রবাসী জীবন সব সময়ই সিদ্ধান্তে অবিচল ছিলেন। ভাষা আন্দোলনের মাত্র ক'বছর পর তরুণ আইনজীবী জিল্লুর রহমান ভৈরবের 'বড় বাড়ী'খ্যাত ঢাকা কলেজের স্বনামধন্য অধ্যক্ষ জালাল উদ্দীন আহমেদের কন্যা জেবুন্নাহার আইভির সঙ্গে ১৯৫৮ সালে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। তার পর থেকে দীর্ঘ জীবন–মাস বছর সংগ্রাম আন্দোলন মুক্তিযুদ্ধ, বঙ্গবন্ধুর হত্যার পর দীর্ঘ কারাবরণে আইভি রহমান ছিলেন প্রতিদিনের প্রতিক্ষণের প্রিয়তমা সহধর্মিণী, দুঃসহ জীবনের বন্ধু, জিল্লুর রহমানের অফুরন্ত প্রেরণার উৎস ছিলেন আইভি। তাই তিনি এত নিঃসঙ্গ, একাকিত্ব বোধ করেছেন। কে যেন হঠাৎ মাথার উপরে স্নিগ্ধ আলোর প্রদীপ নিভিয়ে দিল। তাঁর সকল প্রেরণার অনির্বাণ শিখা নিভে গেছে। তাই গুলশানের ১০৮ নম্বর রাস্তার ২২ নম্বর বাসা আইভি কনকর্ডের ফ্ল্যাটটি নিঃসঙ্গতার অন্ধকারে ডুব দিয়েছে।

প্রিয়তমা স্ত্রীর মর্মান্তিক বিদায়ের পরদিন ২৬ আগস্ট সন্ধ্যায় শোকে মুহ্যমান জিল্লুর রহমানের আইভি কনকর্ডের ফ্ল্যাটে সমব্যথী হিসাবে সাক্ষাত করেছি। প্রায় ৩ দশক পূর্বের এক প্রিয় দম্পতি। রাজনৈতিক সহকর্মী হিসাবে স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে এ দম্পতির সঙ্গে একান্তভাবে পারিবারিক এবং সামাজিক-রাজনৈতিকভাবে কাজ করার সুযোগ হয়েছিল আমার। সে দিনের সেই বিকেলে ৩০ বছর পূর্বের সহকর্মী হিসাবে তাঁর সঙ্গে মিষ্টি মধুর সম্পর্কের রেশ ধরে সত্তরোর্ধ, আধুনিক মনস্ক জিল্লুর রহমান আমাকে বললেন, 'আপনি ভাবিকে হাস্যচ্ছলে বলেছিলেন আপনার গলায় যে ভাঁজ আছে তাতে আপনার নেকলেস পরার প্রয়োজন নেই।' তাই আমি তাঁকে (আইভিকে) বলেছিলাম, "আমি তোমার গলার চেনের ইনস্যুরেন্স করে রাখব।' স্ত্রীর প্রতি কত অগাধ ভালবাসা থাকলে দীর্ঘদিনের একটি ব্যক্তিগত মন্তব্য সযতনে হৃদয়ে ধারণ করে রাখেন। অশ্রুসজল কণ্ঠে জিল্লুর ভাইকে বলেছিলাম আপনার শুধু আমার প্রতি ভালবাসার জন্য হৃদয়ে শ্রদ্ধা লালন করেছি। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর পরই বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক কমিটিতে বঙ্গবন্ধুর সভাপতিত্বে একটি ১১ সদস্যবিশিষ্ট সম্পাদক মণ্ডলীসহ ৩১ সদস্যের কমিটি গঠিত হয়। জিল্লুর রহমান স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রথম সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। ঐ কমিটিতে প্রচার সম্পাদকের দায়িত্ব পেয়ে তাঁর স্নেহের ছায়ায় বাংলাদেশের স্বাধীনতা পরবর্তী আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক দায়িত্ব পালন করি। স্বাধীনতার পর পর বেশ কিছু প্রতিশ্রুতিশীল নারী সংগঠককে বঙ্গবন্ধু রাজনীতি ও তৎকালীন দুর্যোগকবলিত, যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশে সমাজ কর্মে নিয়োজিত করেন। আইভি রহমান ছিলেন নতুন দেশের কর্মে নিয়োজিত এক সফল কর্মী। এদের মধ্যে রাজনীতিতে বদরুন্নেসা আহমেদ, সাজেদা চৌধুরী, মিসেস রাফিয়া আখতার ডলি, অধ্যাপিকা মোমতাজ বেগম, এ্যাডভোকেট সাহারা খাতুন সক্রিয় ছিলেন। আইভি রহমান বাংলাদেশের প্রথম দশকে প্রত্যক্ষভাবে আওয়ামী লীগ কমিটিতে ছিলেন না। তবে তাঁর সাধারণ সম্পাদিকার দায়িত্বে বাংলাদেশ অন্ধকল্যাণ সমিতি দেশব্যাপী প্রসার লাভ করে। তিনি ড. নীলিমা ইব্রাহিমের সভাপতিত্বে বাংলাদেশ মহিলা সমিতির সাধারণ সম্পাদিকা এবং পরে সভানেত্রীর পদ অলঙ্কৃত করেন। এ ছাড়া স্বাধীনতার পর পরই যে মহিলাদের দায়িত্ব পালনরত স্বামীদের পাকবাহিনী হত্যা করেছিল তাঁদের সমন্বয়ে এবং জাস্টিস সোবহানের চেয়ারম্যানশিপে একটি নারী পুনর্বাসন বোর্ড গঠিত হয়, যা বর্তমানের মহিলা উন্নয়ন সংস্থা। তখন শহীদ ডিআইজি মামুন মাহমুদের স্ত্রী মুসফেকা মামুন, শহীদ পুলিশ সুপার মজিদের স্ত্রী মিসেস মজিদ প্রমুখ ঐ সংস্থায় ছিলেন।

আইভি রহমান ছিলেন বাংলাদেশের আলোকিত মহিলাদের অন্যতম। তিনি অসামান্য রূপসী প্রিয়দর্শিনী এক নারী নেত্রী। তিনি প্রিয়ংবদা ও মিষ্টি স্বভাবের নারী। জিল্লুর রহমানের পাশে প্রাত্যহিক জীবনে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের উপরতলার মেয়ে হয়েও ধীরে ধীরে মাটির কাছাকাছি নেমে আসেন। রহিমা, রানী, খালেদা, নূর বানু, জায়েদাদের সঙ্গে যে কোন সভা সমাবেশে এককাতারে মঞ্চের নিচে বসতেন। মহিলা আওয়ামী লীগের সভানেত্রী হওয়ার পরও কখনও নেতৃবৃন্দের সঙ্গে মঞ্চে বসতেন না। ২৬ তারিখে সেই ভয়াবহ দিনের টুকরো স্মৃতি জিল্লু ভাই তুলে ধরে ভাঙ্গা ভাঙ্গা কণ্ঠস্বরে বলেছিলেন, আইভিরা আট বোন। ইতোমধ্যে তৃতীয় বোন মিসেস নুরুন্নাহার এবং ষষ্ঠ বোন মিসেস কামারুন্নাহার পরলোকগত। জেবুন্নাহার আইভি ছিলেন চতুর্থ বোন–আমার স্ত্রীও দুঃখজনক, ভয়ঙ্কর মৃত্যুবরণ করলেন। তাঁর মতে, কিছুটা সাব্যস্ত কণ্ঠে বললেন, 'মৃত্যু তো সবারই হবে। তবে ৬০ বছর বয়সে আইভির মৃত্যু অসময়ে হলো। এ জন্যই তো প্রাণ কাঁদে।' জিল্লুর রহমানের ভায়রা ভাই শামসুল আলম সে সন্ধ্যায় ছিলেন তাঁর সঙ্গে প্রশস্ত হলঘরে, দর্শনার্থীরা একের পর এক আসছে যাচ্ছে। সে দিন তোফায়েল আহমেদও এসেছিল। কথায় কথায় উঠে আসে ২১ আগস্টে জিল্লু ভাইয়ের নিজ অভিজ্ঞতার কথা, সিএমএইচে নিস্তব্ধ, নিস্তরঙ্গ, নিষ্প্রাণ আইভি রহমানের দেহ লাল কম্বলে ঢাকা–আইভি রহমানের কথা। সেদিনের সভায় জিল্লুর রহমান ছিলেন বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার পাশে ট্রাকের উপরে। আইভি ছিলেন রানীদের সঙ্গে ট্রাকের পাশে মাটিতে। হয়ত মাটির টানে মাটিতে মিশে গেছেন তিনি। স্মৃতিতর্পণ করে বলেন, ট্রাকের প্রতি নিক্ষিপ্ত গ্রেনেডটি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে ট্রাকের অপর পাশে পড়ে, ট্রাকের নিচ দিয়ে গড়িয়ে আইভি সহ মেয়েদের একেবারে নিকটে বিস্ফোরিত হয়। এ আরেক পনেরো আগস্ট ঘটানোর অপপ্রয়াস ব্যর্থ হয়। তবে আরেক আগস্ট ম্যাসাকার ব্যর্থ হয় না। নারী-পুরুষসহ ১৮ জন বিস্ফোরিত বোমার আঘাতে রক্তাক্ত প্রান্তরেই নিহত হয়। জিল্লুর রহমান ভিড় ঠেলে বাঁচেন। আহত হয় আওয়ামী লীগের প্রথম সারির নেতাসহ প্রায় ৫ শ' মানুষ। প্রেসিডিয়াম সদস্য আব্দুর রাজ্জাক, সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত, আবু সাইয়িদ, ওবায়দুল কাদের, কাজী জাফরুল্লাহ প্রমুখ। কিন্তু ঐ ট্রাকের পাশেই কালো বলের সাদা শাড়ি পরিহিত আইভি রহমান রক্তস্নাত হয়ে পড়ে আছেন, তা দেখে তারই সহকর্মী লালবাগের রানী। বিশেষ পরিস্থিতি মোকাবেলায় ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের নাম ও ঐতিহ্য দুই-ই ছিল। যেমন ভাষা আন্দোলনের দিনে ২১ শে'তে বা উনসত্তরের উত্তাল গণআন্দোলনে। কিন্তু একুশে আগস্ট আরেক ম্যাসাকার, মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল সামাল দিতে পারেনি। তাই বোমায় আহত জীবন্ত মানুষগুলো ছড়িয়ে পড়েছিল নগরীর প্রাইভেট ক্লিনিকগুলোতে। রক্তাক্ত দেহের আইভিকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেয়ার পথে সকালের সূর্যালোকে তাঁর উদ্ভাসিত মুখাবয়ব কালো বলের শাড়ির মধ্য দিয়ে দেখা গেল তাঁর বিস্ফারিত চক্ষু দু'টি স্থির অচঞ্চল। তাঁর দৃষ্টি স্তব্ধ, গতিহীন ঠিক এমতাবস্থার মধ্যে তাঁর পা দুটি কেটে ফেলা হয়। দেশব্যাপী মানুষের ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া, তীব্র ঘৃণা এবং মহলবিশেষের সম্পৃক্ততা, জনরোষকে প্রশমিত করার ঘৃণ্য কৌশল নেয়া হয় নিষ্প্রাণ নিস্পন্দ আইভি রহমানকে নিয়ে। ডিএমসিএইচ থেকে দ্রুত সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে সে রাতে স্থানান্তর করে শুভানুধ্যায়ী, পরিবার-পরিজন, দলীয় কর্মীদের দৃষ্টির আড়াল করা। প্রাণহীন, নিঃসাড় দেহে কৃত্রিমভাবে বাঁচিয়ে রাখার নাটক করা হয়। দেখা-সাক্ষাতের নাটকীয় চিত্রগুলো ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াতে জনগণকে দেখানো হয়। এত বড় চালাকি, এত বড় প্রতারণা বাংলাদেশের প্রিয়তম এক নারী নেত্রীর মৃত্যু নিয়ে জনগণ ধরে ফেলেছে। তাই আইভির স্বামী ঘৃণাভরে সমবেদনা জ্ঞাপনের সরকারী ইচ্ছা প্রত্যাখ্যান করে বলেছেন, 'আমি স্ত্রী হত্যার বিচার চাই।' জিল্লু ভাই আমাকে বলেন, আইভি কনকর্ডের এত বড় প্রশস্ত বাড়িতে ওর হাতে সব সাজানো, পাশের ফুলদানিটিও তার সাজানো। কী নিয়ে আমি বাঁচব।' রাজনীতির পাশাপাশি যে একটি মানুষের জীবন থাকে–হৃদয় থাকে, জীবনের প্রেরণাশক্তি থাকে নিহত আইভির দাফনের পর যেন তা বিদায় নিয়েছে জননেতা জিল্লুর রহমানের জীবন থেকে। কবির ভাষায়, 'সেই মধু মুখ, সেই মৃদু হাসি, সেই সুধা ভরা আঁখি–/চিরদিন মোরে হাঁসালো কাঁদালো, চিরদিন দিল ফাঁকি।/' হয়ত তাঁর চোখের সামনেই জিল্লুর রহমানের 'জীবন দেবতা' নিষ্ঠুরতমভাবে ছিনিয়ে নেয়া হলো, তা তিনি কী করে সহ্য করবেন? ইতিহাসের পাতা থেকে শুধু স্মরণ করব প্রিয়তমা স্ত্রীর সৌন্দর্য সুষমায় বিমোহিত প্রেমিক শাজাহান মর্মর পাথরে ঢেকে তাঁকে 'স্মরণের আবরণে মরণেরে যত্নে রাখি ঢেকে।' আবার সম্রাট জাহাঙ্গীরের প্রিয়তম পত্নী বিশ্ব সুন্দরী নূরজাহানকেও লাহোর লতাগুল্ম আচ্ছাদিত অযত্নে রক্ষিত কবরে এপিটাফ রেখেছিলেন, 'গরীব গোরে দীপ জেলো না ফুল দিও না কেউ ভুলে/শামা পোকার না পোড়ে পোখ, দাগা না পায় বুলবুলে।' সুতরাং একজন জ্ঞানী, প্রাজ্ঞ ও প্রেমিক স্বামী হিসাবে পিছন ফিরে দেখলে সান্ত্বনা পাবেন। সান্ত্বনা পাবেন ১৫ আগস্ট স্মরণ করলে। তার পর তো বঙ্গবন্ধু কন্যা হাসিনা-রেহানা, বঙ্গবন্ধুর ভাগ্নে শেখ ফজলুল হক মনি, আরজু মনির পরিবার। বিশেষ করে তাপসের কথা। আবুল হাসনাত, কর্নেল জামিলের কথা। মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহীদের কথা। আরেক আগস্টের ম্যাসাকারে শহীদ হয়েছেন জেবুন্নাহার আইভি রহমান। এমনি এক আগস্টে হিরোশিমা ও নাগাসাকির ওপরে বোমা ফাটিয়ে ৫০ লাখ মানুষকে হত্যা করা হয়েছিল। এতদিন আইভি রহমান প্রেরণা যোগাতেন জিল্লুর রহমানকে। আওয়ামী লীগের কর্মীদের আর এখন একটি মহৎ লক্ষ্যের জন্য তাঁর আত্মদান আগামী দিনের সকল নারীর জন্য প্রেরণা যোগাবে। এ দেশের সৎ-সাহসী বঞ্চিত নারীদের অফুরন্ত সংগ্রামের প্রেরণা হবে মাটির কাছাকাছি এক মহীয়সী প্রিয়তম নারীনেত্রী। তাই নশ্বর আইভির চেয়ে অবিনশ্বর আইভি আরও প্রেরণাদায়িনী–আমাদের কাছে শক্তিশালী।

মৌলবাদের উত্থান ও বাংলাদেশ

এম এম আকাশ

বাংলাদেশে কি মৌলবাদের উত্থান হয়েছে বলা যায়? শাসক জোটের অন্তর্ভুক্ত বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী এবং ইসলামী ঐক্যজোটের নেতৃবৃন্দ দাবি করেন যে তাঁদের জোট কোন 'মৌলবাদী জোট' নয় এবং তাঁরা এও দাবি করেন যে তাঁরা মৌলবাদের পৃষ্ঠপোষকতাও করছেন না। ইদানীং সারা পৃথিবীতে যারা মৌলবাদ খুঁজে বার করে তাদের বিরুদ্ধে 'ক্রুসেড' ঘোষণা করেছে, সেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাংলাদেশস্থ রাষ্ট্রদূত হ্যারি কে টমাসও বলেছেন যে, বাংলাদেশ সরকারের অন্যতম অংশীদার জামায়াতে ইসলামী কোন মৌলবাদী দল

নয়। সেই হিসাবে এখন পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে 'মডারেট মুসলিম দেশ' হিসাবে চিহ্নিত করে আসছে। উপরোক্ত দাবিগুলো কতটুকু সত্য সেটাই এই প্রবন্ধে বিচার্য।

বাংলাদেশ যখন স্বাধীন হয়েছিল তখন তা 'দ্বিজাতি তত্ত্বের' ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তানকে ভেঙ্গে ঐ তত্ত্বকে ভুল প্রমাণিত করে স্বাধীন হয়েছিল। অর্থাৎ বাংলাদেশের স্বাধীনতাই প্রমাণ করে দিয়েছিল যে, মুসলমানরা এক জাতি এবং হিন্দুরা আরেক জাতি এ কথা সত্য নয়। বস্তুত-- এই সহজ সত্যটি পৃথিবীর মানচিত্রের দিকে তাকালেই স্পষ্ট হয়ে যায়। পৃথিবীতে কোটি কোটি মুসলমান রয়েছেন, যাঁদের কেউ তুর্কী, কেউ ইরানী, কেউ বাঙালী, কেউ ইংরেজ। আইয়ুব খান এক সময় পাকিস্তান আমলে একবার এক উদ্ভট চেষ্টা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন :

'সারি জবান মিলিঝুলি কার
এক জবান বানা চাহি,
উয়ো উর্দু ভি নেহি, বাংলা ভি
নেহি, উয়ো পাকিস্তানী জবান'

কিন্তু সত্যিই কি বিভিন্ন ভাষার মিশ্রণ ঘটিয়ে একটি ভাষার জন্ম দেয়া যায়? যায় না। তাই আইয়ুব খান ব্যর্থ হয়েছেন। একইভাবে কেউ যদি বিভিন্ন জাতিকে মিশ্রিত করে শুধু ধর্ম-বিশ্বাসের ভিত্তিতে "মুসলমান জাতি" বা 'খ্রীস্টান জাতি' বা "হিন্দু জাতি" বা " বৌদ্ধ জাতি" অথবা নিদেনপক্ষে একটি একক ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলও বানাতে চায় তাহলে সে প্রজেক্টও নিঃসন্দেহে একদিন না একদিন ভুল প্রমাণিত হবে। কিন্তু এই ভুল জিনিসটিই হচ্ছে ধর্মীয় মৌলবাদীদের প্রধান প্রকল্প।

প্রশ্ন হতে পারে যে, ইসলামী "মৌলবাদীরা" বাংলাদেশে কি সত্যই সে ধরনের কোন "প্যান-ইসলামী" প্রকল্পে বিশ্বাসী? যদি সেটা সত্য হয় তাহলে ইসলামী মৌলবাদীদের কাছে 'ইসলাম' নিছক ব্যক্তিগত ধর্মবিশ্বাস রূপে থাকবে না, তারা একে পরিণত করতে চাইবে একটি বিশেষ রাজনৈতিক মতবাদে। বস্তুত সকল ধরনের মৌলবাদীর মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে প্রথমত তার নিজের মতবাদটিই পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মতবাদ হিসাবে বিশ্বাস ও প্রচার করা। দ্বিতীয়ত মতবাদটিকে বিশেষ একটি ক্ষেত্রে প্রযোজ্য না ধরে একে একটি সার্বিক জীবনবিধি হিসাবে গ্রহণ করা। অর্থাৎ ব্যক্তিগত জীবনাচরণ, অর্থনীতি, সংস্কৃতি, রাজনীতি সবকিছুকেই ঐ মূল-মতবাদের আলোকে প্রণয়ন করতে হবে-- এই রকম একটি বিশ্বাস পোষণ করা ও তা কার্যকর করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা।

স্বাভাবিকভাবেই এই ধরনের যে কোন "মৌলবাদী দৃষ্টিভঙ্গির" মধ্যে রয়েছে উগ্র অহঙ্কার এবং এক ধরনের অগণতান্ত্রিক অসহিষ্ণুতা। সেজন্যই বলা হয় যে, সকল মৌলবাদীই নিজেদের "সত্যের একচেটিয়া ব্যবসায়ী" হিসাবে ভাবে এবং নিজের মতবাদকে প্রথমে ভয় দেখিয়ে, লোভ দেখিয়ে এবং শেষ পর্যন্ত দরকার হলে বল প্রয়োগ করে অন্যের ওপর চাপিয়ে দেয়। এ ধরনের কাজ করতে তার বিবেকে বাধে না; কারণ সে হয়ত আন্তরিকভাবে তার বিশ্বাস ও কাজকে শ্রেষ্ঠ হিসাবে ভাবে।

কিন্তু আমরা জানি, মানুষের সমস্ত মতবাদই বাস্তব পরিস্থিতিনির্ভর এবং বাস্তবতা বদলে গেলে ঐ মতাদর্শও একদিন না একদিন অচল হয়ে যেতে বাধ্য। প্রগতিশীল মৌলবাদীরা এই সত্যকে মেনে নিয়েই মূলের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয় বলে তাদের মৌলবাদে স্পর্ধিত অহঙ্কার ও আত্মবিশ্বাস থাকলেও গোঁড়ামি নেই। যুক্তির অস্ত্রই তাদের জন্য মুখ্য, অস্ত্রের যুক্তি তাদের কাছে মুখ্য নয়। তাছাড়া প্রগতিশীলদের বিশ্বাসটি ঐশী বিশ্বাস নয়। তাই এই বিশ্বাসকে সর্বদাই আরেকটি পাল্টা বিশ্বাস দ্বারা চ্যালেঞ্জ করা সম্ভব। আর বাস্তব পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে এসব চ্যালেঞ্জের একটি বাস্তব সমাধানও সম্ভব। কিন্তু ধর্মীয় মৌলবাদের ভিত্তি হচ্ছে 'ঐশী বাণী'। সেখানে এ ধরনের চ্যালেঞ্জকে 'ঈশ্বরের বিরুদ্ধে আক্রমণ' হিসাবে চিহ্নিত করে সহজেই সহিংস আক্রমণকে জাগিয়ে তোলা যায়। তাই বিভিন্ন মৌলবাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অবৈজ্ঞানিক ও বিপজ্জনক মৌলবাদ হচ্ছে "ধর্মীয় মৌলবাদ"। কারণ ধর্মীয় মৌলবাদের শ্রেষ্ঠত্ব যেহেতু "ঐশী চরিত্রের" বলে দাবি করা হয়, সেহেতু এর বিরুদ্ধে যুক্তিতর্ক, দ্বান্দ্বিকতা, পরিবর্তন ইত্যাদির দাবিগুলো মোটেও গ্রাহ্য করা হয় না। ফলে ধর্মীয় মৌলবাদীরা পরিবর্তনের সহজ সত্যটিই মানতে চায় না। তারা বারে বারে ঈশ্বরের বাণীর দোহাই দিয়ে পরিবর্তনকে হয় অস্বীকার করে অথবা উটপাখির মতো চোখ বুজে থাকার চেষ্টা করে। সেজন্য ধর্মীয় মৌলবাদীরা সাধারণত অত্যন্ত রক্ষণশীল হয়। তাদের বিশ্বাস অন্য মৌলবাদীদের তুলনায় আরও শক্ত হয় যেহেতু সেটি অন্ধবিশ্বাস। ওপরে ধর্মীয় মৌলবাদের যে বর্ণনা দেয়া হলো সেই আলোকে যদি আমরা আমাদের বাংলাদেশের অবস্থা বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হই তাহলে কী দেখব?

আলোচনা সংক্ষিপ্ত করার জন্য বলছি, প্রথমত বাংলাদেশের বর্তমান প্রধান শাসক দল বিএনপি অন্তত তার ঘোষণাপত্রে বলেছে যে, তারা "বাংলাদেশী" জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী এবং এই জাতীয়তা ধর্ম নির্বিশেষে বাংলাদেশের সকল নাগরিকের জাতি পরিচয় নির্ধারণ করছে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক বিচারে জাতির এই "বাংলাদেশী" অভিধাটি ধোপে টেকে না, যেহেতু এখানে "নাগরিকত্ব"কে 'জাতীয়তা'র সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা হয়েছে। অবশ্য কেউ নিশ্চয়ই বলতে পারেন, আমি 'বাংলাদেশী বাঙালী', আমি 'বাংলাদেশী সাঁওতাল', আমি 'বাংলাদেশী চাক্‌মা' ইত্যাদি, তাতে কোন ত্রুটি নেই, বরং জাতীয় পরিচয়ে রাষ্ট্রীয় পরিচয়ের বিশেষণ যুক্ত করার একটা বাস্তব প্রয়োজন আমাদের মতো দেশে হয়ত রয়েছে, যেহেতু আমাদের দেশেও বহু জাতির বসবাস ছিল এবং সেই বিভিন্ন জাতির সদস্যরা বহুধাবিভক্ত হয়ে বিভিন্ন দেশে বর্তমানে বসবাস করছে। ফলে বাঙালী জাতি বর্তমানে শুধু বাংলাদেশেই থাকে না, ভারতের পশ্চিমবঙ্গেও থাকে। কিন্তু মোদ্দাকথা হচ্ছে এই যে, বিএনপি দলগতভাবে এখন পর্যন্ত ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তিতে 'মুসলিম জাতীয়তাবাদের' কথা কোথাও বলেনি। যা বলেছে তা হচ্ছে 'রাষ্ট্র' ও জাতিগত পরিচয়ের একটি সংমিশ্রিত রূপ 'বাংলাদেশী' জাতীয়তাবাদের কথা। তাছাড়া এই বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদকে তারা ঈশ্বর প্রদত্ত মতাদর্শ হিসাবেও চালাতে চাচ্ছে না। তবে 'বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ'কে 'বাঙালী জাতীয়তাবাদের' বিপরীতে স্থাপন করতে গিয়ে বিএনপির কোন কোন উগ্রতাত্ত্বিক "পশ্চিমবঙ্গের বাঙালী' ও "বাংলাদেশের বাঙালীদের" মধ্যে মৌলিক জাতিগত পার্থক্যের প্রস্তাব করে এর পক্ষে নানা সাম্প্রদায়িক কুযুক্তির অবতারণা করেছেন। কিন্তু এটা বিএনপির তাত্ত্বিকদের করার

প্রয়োজন ছিল না, কারণ পশ্চিমবঙ্গের বাঙালীরা কখনই বাংলাদেশী বাঙালী হতে চাননি। বরং আজও তাঁরা 'ভারতীয় বাঙালী' থাকতেই পছন্দ করেন বেশি। তাঁদের থেকে আমরা তাই রাষ্ট্রীয়ভাবে আলাদা আছি এবং স্বাভাবিকভাবেই তা সত্য। একইভাবে তাই আমরা দেখি, বাংলাদেশে অনেক হিন্দু ধর্মাবলম্বী বাঙালী রয়েছেন, যাঁরা "বাংলাদেশী বাঙালী" থাকতেই অধিক আগ্রহী। অনুরূপভাবে পশ্চিমবঙ্গেও অনেক মুসলমান বাঙ্গালী রয়েছেন যাঁরা ভারতীয় বাঙালী থাকতেই বেশি পছন্দ করেন। ধর্মের ভিত্তিতে এখানে জাতীয় পরিচয়ের পার্থক্য টানাটা তাই ভুল এবং নিষ্প্রয়োজন।

এছাড়া বিএনপি এখন পর্যন্ত ইসলাম ধর্মকে ভিত্তি করে অর্থনীতি-রাজনীতি-সংস্কৃতি-জীবনাচরণ ইত্যাদিকে ঢেলে সাজানোর কোন আদর্শ প্রকাশ্যভাবে গ্রহণ করেনি। তবে বিএনপি রাজনীতিতে ব্যাপকভাবে ধর্মের ব্যবহার বৃদ্ধি করেছে এ কথা নিঃসন্দেহে সত্য। আর এর ফলে পাল্লা দিয়ে অন্যান্য ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক দলও যে রাজনীতিতে ধর্ম ব্যবহার করতে বাধ্য হয়েছে এ কথাও সত্য। ভোটের জন্য নির্বাচনের সময় সংখ্যালঘু হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের ওপর হুমকি-ধমকিও বিএনপি দিয়েছে। বিএনপি ক্ষমতায় আসার পর পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ থেকে এ কথা স্পষ্টই বোঝা যায় যে, সংখ্যালঘুদের সহায়-সম্পত্তি দখল, অবিচার-অত্যাচার ইত্যাদির মাত্রাও বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু এগুলো কোন মৌলবাদী রাজনৈতিক বিশ্বাস প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য থেকে করা হচ্ছে বলে আমার মনে হয় না। এগুলোর অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে, যে করেই হোক ক্ষমতা দখল করে রাখা। কোন কোন ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী আওয়ামী লীগের সমর্থকদের বিরুদ্ধে পুরনো প্রতিহিংসা ও প্রতিশোধের রাজনীতিও এর পিছনে অনেকাংশে কাজ করেছে বলে মনে হয়। এছাড়া দুর্বলের ওপর সবলের অত্যাচার ও লোভের বশবর্তী হয়ে আক্রমণের বিষয়টি তো ছিলই। কিন্তু যে কারণেই এগুলো বিএনপি করুক না কেন এর ফলাফল হয়েছে সমাজের জন্য খুবই ক্ষতিকর। সমগ্র সমাজে সাম্প্রদায়িক মনোভাব ও বিদ্বেষ এর ফলে বৃদ্ধি পেয়েছে। এ ধরনের কাছাকাছি ঘটনা আমাদের পাশের দেশ ভারতেও ঘটেছে। আমাদের পাশের দেশ ভারতে বিজেপি জোট এক সময় রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে "হিন্দুত্ব আদর্শের" পক্ষে ব্যাপক প্রচার ও সংস্কার চালিয়েছিল। ফলে শেষ পর্যন্ত আমরা সেখানে গুজরাট রাজ্যে এক ভয়াবহ অসভ্য দাঙ্গার সৃষ্টি হতে দেখেছি। সুখের বিষয় যে, বাংলাদেশে সে রকম দাঙ্গা এখন পর্যন্ত হয়নি। তাছাড়া আরও আনন্দের ব্যাপার যে, ভারতের জনগণ বিজেপিকে গত ভারতীয় নির্বাচনে প্রত্যাখ্যান করেছে। ফলে ঐ সাম্প্রদায়িক প্রবণতা আপাতত কিছুটা হলেও ভারতে স্থগিত হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশে আমরা ধর্মকে রাজনীতিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহারের প্রবণতা এবং পাশাপাশি মৌলবাদী রাজনৈতিক দলগুলোর ধীরে ধীরে শক্তি বৃদ্ধির ব্যাপারটি উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছি। ধর্মীয় মৌলবাদী দল রাষ্ট্রক্ষমতার অংশীদার হওয়ার পর এই প্রক্রিয়া আরও ত্বরান্বিত হয়েছে। এটাই বাংলাদেশের মৌলবাদসংক্রান্ত পরিস্থিতির মূল্য বৈশিষ্ট্য।

বর্তমান চারদলীয় জোটের মধ্যে দু'টি দল রয়েছে যারা প্রকাশ্যই ঘোষণা করেছে যে, "আল্লার মতবাদ ইসলামকে" অর্থনীতি, রাজনীতি, সংস্কৃতি, শিক্ষা, সর্বত্রই সামগ্রিকভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করার অঙ্গীকার নিয়েই তারা রাজনীতি করছে। রাজনীতিতে এভাবে "ঐশী মতবাদ'কে টেনে এনে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে তারাই যে শ্রেষ্ঠ দল ও শ্রেষ্ঠ মতবাদের অধিকারী এ ধরনের দাবিও তারা নির্দ্বিধায় করে চলেছে। এই ধরনের দু'টি মৌলবাদী দলই বর্তমানে ক্ষমতার প্রত্যক্ষ অংশীদার। আপাতত তারা বিএনপির সঙ্গে ঐক্য করেছে ঠিকই, কিন্তু সেটা অনেকটা বৃহত্তর শত্রুর বিরুদ্ধে ক্ষুদ্রতর শত্রুর সঙ্গে ঐক্যের একটি সাময়িক কৌশল বলেই বিবেচনা করতে হবে। ইতোমধ্যেই তারা কোথাও কোথাও বিএনপির কর্মীদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র আঘাত ও হত্যাকাণ্ডও সংঘটিত করেছে। তারা প্রকৃতপক্ষে ইসলামী জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী, বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের পক্ষে তাদের কোন তত্ত্বগত সমর্থন নেই। তবু তারা বর্তমানে সেই ছাতির তলেই আপোস করে বসবাসের সিদ্ধান্ত সচেতনভাবে গ্রহণ করেছে। মৌলবাদীদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত সুকৌশলী ও ধূর্ত অংশটি ইতোমধ্যেই সমাজের অলিতে-গলিতে অন্দরমহলে-বহির্মহলে নানারকম আর্থিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতেও সক্ষম হয়েছেন। ফলে তাদের দীর্ঘমেয়াদী "মূল রক্ষণশীল প্রকল্পটি" তারা প্রচলিত আধুনিক জীবনধারার সঙ্গে অনেকখানি মিলিয়ে দিতেও সক্ষম হয়েছে। তাই মধ্যযুগীয় রক্ষণশীল মৌলবাদীদের আজ চেনা যত সোজা, আধুনিক মৌলবাদীদের আজ আর চেনা তত সহজ নয়। বিএনপির পক্ষেও নয়, আওয়ামী লীগের পক্ষেও নয়। তাই এই দুই দলই এদেরকে মিত্র হিসাবে ব্যবহার করতে গিয়ে হাত পুড়িয়েছে এবং পোড়াচ্ছে। কিন্তু বাংলাদেশের ক্ষেত্রে কখনও যদি 'ফ্যাসিবাদের' কোন বিপদ সত্যি সত্যিই দেখা দেয়, তাহলে এই আধুনিক সুসংগঠিত মৌলবাদী শক্তিই হবে তার সবচেয়ে উর্বর মনস্তাত্ত্বিক জন্মভূমি। বস্তুত লুটেরা বুর্জোয়ার পক্ষে এদেশে ফ্যাসিবাদ কায়েম করা কঠিন, কারণ লুটেরাদের সেই এক শীলা সংগঠন থাকে না। কিন্তু আধুনিক ও ধূর্ত ধর্মীয় মৌলবাদীদের রয়েছে আত্মশ্রেষ্ঠত্বে অন্ধবিশ্বাস, তাছাড়া একবার সম্পূর্ণ পরাজয় বরণ করার পর ধীরে ধীরে পুনরায় নবশক্তিতে উত্থিত এই শক্তির আত্মবিশ্বাস ও সাংগঠনিক ক্ষমতাও এখন যথেষ্ট সুদৃঢ়। সুতরাং এরা যে তাদের মৌলবাদী প্রকল্প কার্যকর করার জন্য আরেকবার মরিয়া হয়ে শেষ চেষ্টা করবে না তা কিছুতেই হলফ করে বলা যায় না।

বর্তমানে লুটেরারা আত্মবিবাদে ও লুটপাটে মগ্ন। বামপন্থীরা বিকল্প শক্তি গড়ায় ব্যস্ত। উদারনৈতিক বুর্জোয়ারা সেমিনার ও সিভিল সোসাইটি নিয়ে তৎপর। কিন্তু আধুনিক মৌলবাদীরা তলে তলে ধারাবাহিকভাবে প্রাতিষ্ঠানিক প্রস্তুতি নিয়ে চলেছে, শেষ ছোবল হানার প্রস্তুতি। আর অন্যদিকে সাধারণ মানুষ ক্রমাগতই হয়ে পড়ছে নিরতিশয় হতাশ, রাজনীতিবিমুখ। এরকম অবস্থায় কোনদিন ঘুম ভেঙ্গে আমরা যদি দেখি 'বাংলাদেশ' 'পাকিস্তান' হয়ে গেছে, তখন অবাক হলেও আর করার কিছু থাকবে না।